পাঠকের মতামত

হারিয়ে গেল দু'হাজার স্কুল

ফেল করলেও পাশ, সামান্য বকাঝকাও বন্ধ, অপরাধ করলেও শাস্তি নয়। সরকার ছাত্রদের উপর চাপ কমানোর নামে এ রকম যত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ততই অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের সরকারি বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করছেন। কঠোর অনুশীলন বা বিদ্যাভ্যাসের মধ্যেই যে ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতি হয় তা অভিভাবকরা বেশ উপলব্ধি করেছেন। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার যে অতি সরলীকরণ করা হয়েছে তাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে সরকারি বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা হু হু করে কমছে। মানুষ বাধ্য হয়ে তার সন্তানকে ভর্তি করছে বেসরকারি স্কুলে।

শিক্ষা এখন নামমাত্র সর্বজনীন। আর পাঁচটা পণ্যের জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সর্বজনীন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা তার গুণগতমান ক্রমশ হারাচ্ছে। বিদ্যাসাগর শিক্ষার ব্যাপক প্রসার (গণশিক্ষা) চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কখনওই তিনি গুণগত মানকে বাদ দিয়ে নামমাত্র শিক্ষার প্রসার চাননি। গণশিক্ষার নামে সরকার কৌশলে মানুষকে বাধ্য করছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ঠেলে দিতে। এর ফলে সরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তো দূরের কথা যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি সাহায্যে চলে আসছে সেগুলিও বন্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কলকাতার মতো শহরে প্রায় দু'হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রাভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও ঠিক সেই দিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে সরকারকে যে নতুন নতুন বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হত বা শিক্ষক নিয়োগ করে অর্থ ব্যয় করতে হত তা আর করতে হল না। মানুষকে এবার হাজার, লক্ষ টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনে নিতে হবে।

দেশে 'সকলের জন্য শিক্ষা' দেওয়ার রীতিকে সুকৌশলে তুলে দিয়ে 'অর্থ যার শিক্ষা তার'-এই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গুণগত মান বর্জিত নামমাত্র শিক্ষা দিয়ে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকে আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ক্রমাগত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার যে কোনও ডিগ্রি আজ আর লক্ষ টাকার নিচে পাওয়া যায় না।

এভাবেই শিক্ষার দায়ভার আমাদের দেশের কর্ণধারেরা ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। বেসরকারি মালিকদের হাতে শিক্ষা আজ মহার্ঘ পণ্যে পরিণত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ বাড়ির সন্তানদের জন্য আর কোনও সরকারি বিদ্যালয় অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা অবাধে 'সূর্যের কিরণের মতো' বা 'বৃষ্টির ধারার মতো' সমানভাবে শিক্ষা পাবে।

কিংকর অধিকারী,
বালিচক, পশ্চিম মেদিনীপুর

পাশ-ফেল

তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক তল্লাটে একমাত্র,
আমি এবং আরও অনেক ছিলাম তাঁর ছাত্র।
তখন ছিল 'স্নাতক' ছাত্র দেখতে পাওয়া ভার,
'সাম্মানিক' ডিগ্রিটিও সঙ্গে ছিল তাঁর।

বাহুল্য ছিল না তাঁর প্রাত্যহিক বেশে,
ছাত্রদের বলতেন তিনি ডেকে হেসে হেসে,
"মাত্র একবার পরীক্ষাতে ফেল করেছ তুমি,
এই দেখো না তিন-তিনবার ফেল করেছি আমি,
মনে রেখো ফেলিওর ইজ দি পিলার অফ সাকসেস",
আজও আমার কানে বাজে সেই কথারই রেশ।

জেনে রেখো পাশ ও ফেল দুটোই খুব দামি,
আমার সারা জীবন ধরে তাই শিখেছি আমি।
কোনও সরকার এই কথাটি আজ তোলে না কানে,
আমরা যেন ভুলে না যাই এই কথাটির মানে।

অনাদিপ্রসাদ মাজী,
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ঝাঁপড়া, পুরুলিয়া

৩০ জানুয়ারি মহামিছিলে সামিল হোন

একের পাতার পর

মানুষ। উৎপাদন যতই কমুক একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার পাহাড় এতটুকুও টোল খাবে না। কিন্তু নতুন করে ছাঁটাই হবেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। নতুন করে ঝাঁপ বন্ধ হবে বেশ কিছু কলকারখানার। তার শ্রমিকরা কিছুদিন কারখানার দেওয়ালের আশেপাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে অভাবের জ্বালায় প্রথমে ঘটিবাটি বন্ধক দেবেন, তাঁদের ঘরের মেয়েরা অভাবের জ্বালায় নিজের মাংস বেচতে বাজারে লাইন দেবে। বন্ধ চা বাগান শ্রমিকের ঘরের মেয়ে থেকে শিশুরা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাবে মানুষরূপী পশুদের লালসার বাজারে। তারপর— এতেও যখন কুলোবে না, শেষ আশ্রয় হবে রেললাইনে গলা দেওয়া, না হলে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া! ভোটের কারবারিরাও তাদের নিয়ে খানিকটা চোখের জল ফেলে একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগবেন। কিন্তু ভোটে যারাই জিতুক বন্ধ কারখানার-কাজ হারানো ওই সমস্ত শ্রমিকের কোন উপকারটি হবে?

কী কেন্দ্র, কী রাজ্য কোনও সরকারই প্রতিশ্রুতির ফোয়ারায় কিছু কম যায় না। এই মোদি সাহেব বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দিয়ে ফেলছেন, তো রাজ্যের তৃণমূল সরকার এককোটি চাকরি দিয়েই ছাড়ছেন। অথচ দিনে দিনে কমছে স্থায়ী কাজের সুযোগ, চাকরি নতুন হবে কি যারা কাজ করছিল তাদের কাজ চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন বাড়ছে বেকার সংখ্যা। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দপ্তর, রেল থেকে শুরু করে রাজ্যের সরকারি চাকরিতে অসংখ্য পদ খালি। অথচ উভয় সরকারই সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। সামান্য যা নিয়োগ হচ্ছে তাও অস্থায়ী ক্যাজুয়াল কিংবা ঠিকা হিসাবে। সরকারি কাজ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়াটাই রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরাও সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি দূরে থাক সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে দিনে দিনে ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছেন। আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-আইসিডিএস কর্মীরা সারা বছর কাজ করে পরিবার প্রতিপালন দূরে থাক, একজনের পেট চলার মতো ভাতাটুকুও পাচ্ছেন না। একসময় বেকার যুবক-যুবতীদের সামান্য কিছু বেকারভাতা ভিক্ষার মতো ছুঁড়েও সরকার দিত, এখন সেটুকুও বন্ধ। এইসব খেটে খাওয়া মানুষের দাবি কি ভোটের বাক্সে কোনও দিন সমাধান হয়েছে? নাকি আদায় যা হয়েছে আন্দোলনের ময়দানেই।

ভোটের গন্ধে কৃষক দরদে যেন জোয়ার এসেছে দেশ জুড়েই। তাতে কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল কেউ কম যায় না। অথচ কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম কোথায়? দেশ জুড়েই এখন ধান উঠেছে, একই সাথে উঠছে সবজি-ডাল-পেঁয়াজ এমন কত ফসল। আগে ছড়ায়-কবিতায় এই পৌষে চাষির মুখের হাসির কত না ছবি আঁকা হত! অথচ ঠিক এই সময়টাতেই আজ ভারতের হাজার হাজার চাষি পরিবারে হাহাকার। ফসল বিক্রি করে তাঁদের খরচটুকুও উঠছে না। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষি, অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা-তামিলনাড়ুর ধানচাষি, উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাবের আখচাষি, হরিয়ানার গমচাষি যেমন সর্বনাশের দোরগোড়ায়, সারা দেশেই চলছে চাষির আত্মহত্যার মিছিল। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ধানচাষিরাও লাভজনক মূল্য দূরে থাক, সরকারি সহায়ক মূল্যটুকুও পাচ্ছে না। সরকার নিজেই রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে স্বীকার করছে চাষিদের নাম করে এই দাম লুটে নিয়ে যাচ্ছে মধ্যসত্ত্বভোগী ফড়ে-মহাজনরা। সরকার ধানকল মালিকদের উদ্দেশে মাঝে মাঝে কাগুজে হুঙ্কার ছাড়ছে, চাষির থেকে ধান কেনার লক্ষমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্যও তাদের কোনও সদিচ্ছা আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে বড় বড় ধানকল মালিক, খাদ্যশস্য ব্যবসায় টাকা ঢালা বড় বড় পুঁজিমালিকদের কারসাজিতে খোলাবাজারে চালের দাম কমার বদলে বাড়ে। অন্যদিকে চাষি ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেই জ্বালা জুড়োতে বাধ্য হয়। রাজ্য সরকার নাকি আত্মঘাতী চাষির পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেবে। অথচ চাষির চাষের খরচ যাতে কমে, সার-বীজ, কীটনাশক, ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি চাষিদের যেভাবে শোষণ করে তার বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিলে চাষিকে আত্মঘাতী হত না। সরকার চাষিকে সেচের পাম্পের জন্য ডিজেল কিংবা বিদ্যুৎ সস্তায় দেওয়ার বন্দোবস্ত করলে, পরিকল্পনা মাফিক খাল কাটলে চাষির জীবন বাঁচত। সে কাজ সরকার করল না।

চাষিকে ফসলের ন্যায্য দাম পাইয়ে দেবে কে? ঋণমকুবের মিথ্যা ফানুস দেখিয়ে চাষিকে আরও যারা ঋণের জালে জড়াতে চায় তারা? একচেটিয়া মালিকদের হাতে কৃষিপণ্যের পুরো বাজারটাকে যারা খুলে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা? কোনও ভোটবাজ দল কি কোনও দিন চাষির চোখের জল মুছিয়েছে? নাকি চাষিকেই দাবি আদায় করতে হয় সংঘবদ্ধ ভাবে! এসেছে সেই বিচারের দিন।

এই পশ্চিমবঙ্গে আজও অনাহারে মানুষ ধুঁকতে ধুঁকতে মরে। ১০০ দিনের কাজের মজুরি মেলে না। হাসপাতালে গেলে মেলে না চিকিৎসা-ওষুধ। অথচ পাড়ায় পাড়ায় মদের স্রোত বইয়ে দেওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত রাজ্য সরকার। দরিদ্র সাধারণ পরিবারগুলি ভেসে যাচ্ছে মদের নেশার সর্বনাশা টানে। মদ্যপদের হাতে শিশুকন্যা থেকে শতায়ু বৃদ্ধা কারও রেহাই নেই। অথচ রাজস্বের লোভে ঢালাও মদের প্রসারেই ব্যস্ত সরকার। নারী পাচারে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষ স্থানে আছে। রাজধানী দিল্লি সহ সারা দেশেই প্রতিদিন যেমন ধর্ষণ থেকে খুন চলছে, পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের সাজা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। সব মিলিয়ে চলছে এক শ্বাসরোধকর পরিস্থিতি।

সিপিএম সরকার তাদের আমলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি এবং পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে একটা বিরাট প্রজন্মের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি করে গেছে। তৃণমূল ২০১১-তে ক্ষমতায় এসেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের করা আইনের দোহাই দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে সেই ক্ষতিকে আরও বহুগুণ বাড়িয়েছে। সারা দেশেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার জনমতের চাপে পাশ-ফেল ফেরানোর কথা কিছুটা হলেও মানতে বাধ্য হয়েছে। ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই ডাকা ধর্মঘটের সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতেও বাধ্য হয়ে ছিল। কিন্তু আজও তারা এ নিয়ে কেন্দ্রের দোষ দিয়ে টালবাহানা করে চলেছে। এই একটি নীতিতে কোটি কোটি সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে, রাজ্যের বহু বাংলা বা হিন্দি মাধ্যম সাধারণ স্কুলগুলি উঠে যাওয়ার দশায় পৌঁছেছে। স্কুলস্তর থেকেই শিক্ষা প্রায় পুরোপুরি বেসরকারি হাতে চলে গেছে। শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার পথ খুলে রাখতেই কি সরকারের এই কালক্ষেপ! এই প্রশ্ন উঠেছে জনমনে। আজ দাবি উঠেছে একটি দিনও বিলম্ব নয় সরকার এখনই ঘোষণা করুক প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ- ফেল ফিরিয়ে আনা হবে।

চাষি, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, খেটেখাওয়া সব স্তরের মানুষের এই জ্বলন্ত দাবিগুলি নিয়ে আজ দরকার তীব্র আন্দোলনের জোয়ার তোলা দেশ জুড়ে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের একচেটিয়া মালিকদের নির্লজ্জ সেবার নীতির বিরুদ্ধে বামগণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামবে এটাই ছিল আজ সময়ের দাবি। অথচ ভোটের বাদ্যি বাজতেই তথাকথিত বৃহৎ বামপন্থীরা হিসাব করতে বসেছে কী করে কিছু সিট বাগিয়ে নেওয়া যায়। তার জন্য কংগ্রেস কিংবা জাতপাতবাদী নানা দলের সাথে যে কোনও শর্তে আপসেও তারা রাজি। আশার কথা নানা কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষ আজ বুঝছে আন্দোলনই পথ, শুধুমাত্র সরকার বদলের খোয়াব দেখে তার কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। আন্দোলন বারেবারে মাথাচাড়া দিতে চাইছে। মধ্যপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলন তো এই সত্যকেই দেখিয়ে দিয়েছে। অথচ এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া সব দল ব্যস্ত এই ক্ষোভকে আবার ভোটের বাক্সে পুরে ঠাণ্ডা ঘরে জমা করতে।

তাই ডাক এসেছে আন্দোলনের। এসেছে ৩০ জানুয়ারি মেহনতি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সকল স্তরের মানুষের বজ্র নির্ঘোষে তোলা দাবিকে দরিদ্রের কুটির, শ্রমিকের কারখানায়, কৃষকের খেতে, ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার ডাক। এ ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসছেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁরা পা মেলাবেন হেদুয়া পার্ক থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মহামিছিলে।

গো-রক্ষার নামে বিজেপির জুলুমে বিপদে পড়েছেন চাষিরা

স্কুলে, কলেজে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘর ভর্তি গরুতে! হাসির বিষয় নয়, উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকারের গো-রক্ষার জুলুমের সামনে মরিয়া হয়ে চাষিরা তাদের ফসল বাঁচাতে কয়েক হাজার গরু-বাছুরকে এমনভাবেই ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন সরকারি অফিসে, স্কুলে।

বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজত্বে সাধারণ মানুষ তো কোন ছার, গো-রক্ষকরা পুলিশ অফিসারকে পিটিয়ে মারলেও সরকার নড়ে বসে না। মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত অক্লেশে বলে দেন, ইনস্পেক্টর সুবোধ সিংহের হত্যা একটা সামান্য দুর্ঘটনা। সরকার গো-রক্ষা নিয়ে বেশি চিন্তিত। এর আগে রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডে বিজেপি-আরএসএসের মদতপুষ্ট গো-রক্ষা বাহিনীর তাণ্ডবে প্রাণ গেছে বেশ কয়েকজন দুধ ব্যবসায়ী ও সাধারণ চাষির। ঘরে গরুর মাংস রাখার গুজব ছড়িয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে পরিকল্পিত গণপিটুনিতে প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে মহম্মদ আখলাকের। কিছুদিন আগে রাজস্থানে গো-সন্তানদের গণপিটুনিতে দুধ ব্যবসায়ী আকবর খানের মৃত্যুর পর সামনে এসেছিল এক সাংঘাতিক সত্য।

রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র কিংবা গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিতে আরএসএস-বিজেপি-বিশ্বহিন্দু পরিষদ-বজরঙ্গ দলের মতো হিন্দুত্বের স্বঘোষিত অভিভাবক দলের নেতারা ‘গো-রক্ষা’র নামে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন ক্ষমতায় থাকার সময়। শুধু রাজস্থানের আলোয়ারেই এদের পরিচালনায় বেশ কয়েকটি ‘গোশালা’ চালু হয়েছে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে কেউ রাজস্থানের হাট থেকে গরু, ছাগল, ভেড়া, উট যে কোনও পশুই কিনুক না কেন এই বাহিনীকে তোলা না দিয়ে তাদের উপায় নেই। টাকা আদায়ের জন্য এরা চালু করেছে ‘চেকপোস্ট’ যেখানে স্থানীয় থানার পুলিশও গো-রক্ষক বাহিনীর সাথে বখরার ভিত্তিতে পাহারা দেয়। পশু কিনে কেউ রাস্তা দিয়ে হেঁটে বা গাড়িতে গেলেই এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। টাকা না পেলে কেড়ে নেয় গরু ভেড়া যা পায়। এমনকী গো-রক্ষার ধুয়ো তুলে নানা গ্রামে হানা দিয়ে গোরু কেড়ে আনে ওরা। টাকা দিয়ে ছাড়াতে পারে না যারা, তাদের পশুগুলিকে আবার বিক্রি করে দেয় এই ‘গো-রক্ষকরা’। এদের হাতে পশুপালক উপজাতিদেরও ছাড় নেই। ধর্মে হিন্দু ‘রাবারি’ উপজাতির মানুষরা গুজরাট থেকে হাঁটাপথে রাজস্থান এসে পশু কিনে আবার গুজরাটে ফিরে যান। বহুকাল ধরে তাঁদের এই জীবিকা চলছে। কিন্তু কয়েকবছর ধরে আলোয়ার পার হওয়ার সময় ‘গো-রক্ষা চেকপোস্টে’ তোলা না দিলে জোটে মারধোর। জোর করে টাকা কেড়ে নেওয়াটা গো-রক্ষকদের কাছে তো জলভাত। আকবর খানের মৃত্যুর পর রাবারি উপজাতির এক মোড়ল সাংবাদিকদের বলেছিলেন, বাঁচতে গেলে ওদের টাকা না দিয়ে উপায় নেই (দ্য টেলিগ্রাফ ২৪ জুলাই, ২০১৮)।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার সমস্ত আইনি-বেআইনি কসাইখানা বন্ধ করে দেওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার গবাদি পশুর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের আইন আনার পর থেকে উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা এক মারাত্মক সংকটে পড়েছেন। বর্তমানে মেশিন-ট্রাক্টরের প্রচলন এতটাই বেড়েছে যে, চাষের কাজে গরু মোষের ব্যবহার প্রায় নেই। দুধ উৎপাদনের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর কৃষকরা তাঁদের উদ্বৃত্ত গোরু-মোষ এতদিন বিক্রি করে দিতে পারতেন। কিন্তু সরকারি আইন এবং বিজেপি মদতপুষ্ট গো-রক্ষকদের মারের ভয়ে তাঁরা গরু মোষ নিয়ে কোথাও যেতে ভয় পাচ্ছেন। এদিকে ঘরে বসিয়ে গরু-মোষকে খাওয়ানোর সামর্থ্য তাঁদের নেই এবং সেটা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নেহাত অলাভজনক। স্বাভাবিক ভাবেই তারা গরু ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে বেওয়ারিশ গবাদি পশুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। তারা রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার কারণ হচ্ছে, চাষিদের ফসল খেয়ে নষ্ট করছে। চাষিরা অসহায়, কারণ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে গরু আটকাতে গেলে সেই বেড়ায় যদি কোনও গরুর আঘাত লাগে তাতে গো-রক্ষকদের হাতে চাষি পরিবারের হেনস্থা এমনকী খুন হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে। এদিকে ছেড়ে দেওয়া বেওয়ারিশ গরু ফসল নষ্ট করায় দুই কৃষক পরিবারে খুনোখুনির ঘটনাও ঘটছে। আলিগড়, আগ্রায় মরিয়া চাষিরা বেওয়ারিশ গবাদি পশুর পাল ঠেকাতে অ্যাসিড ছুঁড়েছেন এমন ঘটনাও ঘটছে। বিপন্ন কৃষকরা গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি স্কুলে ঢুকিয়ে গরুর পালকে বন্দি করে রাখছেন। উত্তরপ্রদেশের মথুরায় একটি স্কুলে ৮০০ গরুকে বন্দি করে তাঁরা পুলিশ ডেকেছেন। এমন ঘটনা বহু স্থানে ঘটছে। ক্ষতি হচ্ছে ছাত্রদেরও। বিপদে পড়েছেন ডেয়ারি চাষিরাও। আগে রাজস্থান-হরিয়ানায় নিয়মিত দুধেল গাইয়ের মেলা হত। তাঁরা সেখান থেকে প্রয়োজন মতো গরু কিনতে পারতেন। এখন গো-রক্ষকদের ভয়ে গরু নিয়ে কেউ রাস্তায় বার হতে পারে না। ফলে মেলাও বন্ধ।

উত্তরপ্রদেশ সরকার গোশালা করার নামে কয়েক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। গো-রাজনীতির জোয়ারের টানেই বিজেপি ২০১৯-এর ভোট বৈতরণী পার হওয়ার পরিকল্পনা করছে। তাদের গো-রক্ষার ভণ্ডামিতে শুধু চাষিরা মরছেন তাই নয়, গবাদি পশুগুলিও চূড়ান্ত কষ্টে পড়ছে। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় সম্প্রতি গোশালার অব্যবস্থায়, খাদ্য-জলের অভাবে প্রাণ হারিয়েছে কয়েক হাজার গবাদি পশু। তাতে বিজেপির কিছু আসে যায় না। তারা হিসাব করছে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ভোটব্যাঙ্কের পকেটে পুরতে।

ভোটব্যাঙ্ক হারানোর আশঙ্কায় কংগ্রেস এই গো-রাজনীতির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা দূরে থাক, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পালেই হাওয়া লাগাচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতি মন্দিরে মন্দিরে পৈতে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিজেপি-কংগ্রেস উভয়েরই নীতিহীন ভ্রষ্ট রাজনীতির শিকার হচ্ছেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ কৃষক— যাঁরা গবাদি পশুকে নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দিন কাটিয়েছেন, তাদের ব্যবহার করেছেন, যত্ন করেছেন, আবার প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাতে গরুর সংখ্যা কমেনি শুধু নয়, নিজের প্রয়োজনেই মানুষ গবাদি পশুর উন্নতিতে মন দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করায় কৃষকের স্বাভাবিক জীবনযাপনেই সংকট নেমে এসেছে। সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ির সস্তা রাজনীতির চমক যে সমাজের কী মারাত্মক ক্ষতি করে, এ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কংগ্রেস যদি ‘সেকুলার’ আরএসএস বন্ধু হয় কী করে!

কংগ্রেস যে আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ নয়, তা ‘গণদাবী’র পাতায় বহুবার প্রমাণ সহ তুলে ধরা হয়েছে। তবুও যাঁদের ধন্ধ মেটেনি, তাঁরা পড়ে নিতে পারেন ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ সংবাদপত্রের সহকারি সম্পাদক রশিদ কিদওয়াইয়ের ‘ব্যালট— টেন এপিসোডস দ্যাট শেপড ইন্ডিয়াজ ডেমোক্রেসি’ বইটি। এতে তিনি দেখিয়েছেন, বাবরি মসজিদ ভাঙা, রামমন্দির তৈরির খেলা ও তাকে কেন্দ্র করে যে কদর্য রাজনীতি এ দেশে চলছে তার প্রধান হোতা কংগ্রেস।

কংগ্রেস ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ ‘হিন্দু তাস’-এর ভিত্তিতে পরিচালনা করেছিল। একজন শিখ রক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার অব্যবহিত পরে ওই ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেশ জুড়ে তখন কংগ্রেস নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে শিখ নিধন চলছিল। ভিন্দ্রানওয়ালে ও তাঁর সশস্ত্র গোষ্ঠীকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে ‘অপারেশন ব্লু স্টার’ নামে সেনা অভিযান এবং ভিন্দ্রানওয়ালের হত্যার ঘটনা তার আগেই ঘটে যায়। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের ফোকাস ছিল — শিখদের পৃথক ‘হোমল্যান্ড’ চাওয়ার বিরুদ্ধে। ওই বইয়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ “দ্য বিগ ট্রি অ্যান্ড দ্য স্যাপলিং”-এ বলা হয়েছিল, ‘কংগ্রেসের গোপন অ্যাজেন্ডা ছিল হিন্দু মানসিকতায় নিরাপত্তাহীনতার বীজ ঢুকিয়ে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে একমাত্র রক্ষাকর্তা হতে পারে তা বুঝিয়ে হিন্দু ভোট নিশ্চিত করা’।

ওই বইতে আরও বলা হয়েছে, ‘নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষে আরএসএস-এর সমর্থন চেয়ে নাগপুরের কংগ্রেস এমপি বনোয়ারিলাল পুরোহিতের মাধ্যমে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেছিলেন’। আর ওই সমর্থনের বিনিময়ে আরএসএস অযোধ্যায় রামজন্মভূমি শিলান্যাসের অনুমতি চেয়েছিল। সেই নির্বাচনে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সত্ত্বেও আরএসএস তার পাশে না দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে দু’হাত তুলে সমর্থন করেছিল।

রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ নেহেরু এক সাপ্তাহিকীতে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে ‘মুসলিম কার্ড’ খেলতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ‘মুসলিম মহিলা বিল’ পাশ করানো হয়েছিল এবং তারপর ‘হিন্দু কার্ড’ খেলার জন্য অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের তালা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।” তিনি আরও বলেছিলেন, “মসজিদের তালা খোলার দু’দিন পর এক সন্ধ্যায় আমি রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। তিনি তখন দূরদর্শনে দেখছিলেন মসজিদের ভিতরে রামলালার পূজা চলছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এসব জিনিস দূরদর্শনে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে? তিনি কোনও উত্তর দেননি, মৃদু মৃদু হাসছিলেন, আর পূজা দেখছিলেন। আমি তারপর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম যে, কে এইসব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি উত্তরে জানান, আপনি প্রধানমন্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা করুন।”

তারপর ১৯৮৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে হিন্দু ভোট আরও নিশ্চিত করতে রাজীব গান্ধী আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে বাবরি মসজিদের কাছেই রামমন্দিরের শিলান্যাসের অনুমতি দেন। রামমন্দির ইস্যু অতি দ্রুত কংগ্রেসের হাত থেকে সংঘ পরিবারের হাতে চলে যায়। বস্তুত ওই শিলান্যাসই ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ভাঙা ও তার পরবর্তী ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বপন করেছিল।

কংগ্রেসের সঙ্গে আরএসএসের গভীর সম্পর্কের আরও উদাহরণ পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও সিকিমের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র প্রাক্তন প্রধান টি ভি রাজেশ্বরের বই ‘দ্য ক্রুসিয়াল ইয়ার্স’-এ। ওই বইতে বলা হয়েছে বালাসাহেব দেওরস ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত জরুরি অবস্থার বহু পদক্ষেপের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। রাজেশ্বর বলেছিলেন, “তাঁরা (আরএসএস) জরুরি অবস্থার কেবল সমর্থক ছিলেন তাই নয়, সেই সমর্থন প্রকাশ করার জন্য দেওরস এমনকী ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন”। ওই বইতে বলা হয়েছে, আরএসএস ইন্দিরা গান্ধীকে ভোটের সময় সমর্থন করতে চেয়েছিল এবং তা জানানোর জন্যও সরসঙ্ঘচালকের প্রয়োজন ছিল ইন্দিরা ও সঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার।

এই সমস্ত তথ্য থেকে এটা জলের মতো পরিষ্কার যে ইন্দিরা কংগ্রেস তথা কংগ্রেসের সঙ্গে চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি আরএসএস-এর সম্পর্ক কত সুগভীর ও সুপ্রাচীন। অন্যদিকে আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির রসায়ন কারও অজানা নয়। অথচ এই কংগ্রেসের গায়ে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ তকমা লাগিয়ে সিপিএম বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জোট বাঁধতে উঠে পড়ে লেগেছে!

উত্তর ২৪ পরগণায় শিক্ষা কনভেনশন

অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু ও শিক্ষার নানা দাবিতে ৬ জানুয়ারি বারাসাত সুভাষ ইনস্টিটিউটে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক-অভিভাবক ও ছাত্রদের শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা ছিলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক কার্তিক সাহা। পার্থ ভট্টাচার্যকে সভাপতি এবং প্রবোধ সরকারকে সম্পাদক করে জেলা সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কার্ল লিবনেখট ও রোজা লুক্সেমবুর্গ স্মরণে
জার্মানিতে লাল পতাকার মিছিল

জার্মানির কমিউনিস্ট নেতা কার্ল লিবনেখট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের ১০০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁদের ছবি নিয়ে ১৩ জানুয়ারি বার্লিনে বামপন্থীদের মিছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্রোতে ভেসে যাওয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালান রোজা। কার্ল লিবনেখট ও রোজা যৌথভাবে জার্মানিতে পুরনো শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলেন। ১৯১৮ সালে জার্মানিতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ডাক দেন তাঁরা। সরকার ও রাষ্ট্রের ভাড়াটে ঘাতকরা ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে এই দুই বিপ্লবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আজও বিশ্বের দেশে দেশে তাঁদের নাম কমিউনিস্টদের প্রেরণা দেয়। জার্মানির এই মিছিল প্রমাণ করে কমিউনিজমের আদর্শকে শাসক বুর্জোয়ারা ভুলিয়ে দিতে পারেনি, পারবেও না।

সহায়ক মূল্যে ধান কেনার দাবিতে পথ অবরোধ

সহায়ক মূল্যে ধান কেনা সহ বিভিন্ন দাবিতে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কনট্রোলার সহ বিভিন্ন ব্লকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ১০ জানুয়ারি হিড়বাঁধ ব্লকের হাতিরামপুর বাজারে অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠনের নেতৃত্বে চাষিরা ধান ফেলে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

সার-বীজ-কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কৃষি জমির মিউটেশন ফি মকুব এবং গরিব চাষিদের কৃষিঋণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড তারাশঙ্কর গোপ এবং কমরেডস নরেন্দ্রনাথ কুম্ভকার ও বৈদ্যনাথ মণ্ডল।

৬০০ টাকা ফি কমল আন্দোলনের চাপে

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র নেতৃত্বে কয়েক শত ছাত্র-অভিভাবকের আন্দোলনের চাপে জয়নগরে মজিলপুর শ্যামসুন্দর বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ জানুয়ারি বাড়তি ফি ফেরত দিতে বাধ্য হলেন। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফি ৯৪০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩৪০ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণিতে ফি ১৩০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৭০০ টাকা করা হয়েছে। আন্দোলনের এই জয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাত্র ও অভিভাবকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়।

একই ভাবে ফি কমানোর দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে এআইডিএসও।

মুম্বই বাস শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট
সংহতি জানাল এস ইউ সি আই (সি)

৮ জানুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘটে নেমেছেন মুম্বইয়ের ৩০ হাজার বাস শ্রমিক। বিজেপি-শিবসেনার রাজ্য সরকার এবং মুম্বই পুরসভা এই ধর্মঘটী বাস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর পরিবর্তে অগণতান্ত্রিক কালা আইন 'মেসমা' (মহারাষ্ট্র এসেন্সিয়াল সার্ভিস মেনটেন্যান্স অ্যাক্ট) জারি করে দমন পীড়নের রাস্তা নিয়েছে।

এই ধর্মঘটের পাশে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি এবং এস ইউ সি আই (সি) দল। ১৩ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে দাবি জানায় বাস শ্রমিকদের ধর্মঘটের উপর বলপ্রয়োগ করা চলবে না। দলের মুম্বই সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী এক বিবৃতিতে বলেন, 'সরকার, মুম্বই পুরসভা এবং বেস্ট (বৃহন্মুম্বই ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট) কোম্পানির ন্যক্কারজনক মনোভাবই ধর্মঘটী শ্রমিক, তাঁদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশাকে দীর্ঘায়িত করছে।' তিনি বাস শ্রমিকদের সমস্ত দাবি পূরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

মুম্বইয়ের বাস পরিষেবা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণপরিহণ ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত। এই পরিষেবার শ্রমিকরাই আজ সংকটে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবি— বৃহন্মুম্বই পুর করপোরেশন এবং বেস্ট কোম্পানির পরিবহণ বাজেট সংযুক্ত করা, বেতন সেটলমেন্ট, ১৪ হাজারের বেশি অস্থায়ী কর্মীর স্থায়ীকরণ, বোনাস এবং আবাসন সমস্যার সমাধান। বেস্ট কোম্পানি বিপুল মুনাফা করলেও বেশিরভাগ বাসকর্মীকে ১২ হাজার টাকার বেশি মাইনে দেওয়া হয় না। বিজেপি-শিবসেনা প্রশাসন বাস সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়ে বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পরিবহণ ব্যবসায় সুবিধা করে দিতে চায়। ফলে তারা বেস্ট কোম্পানির ১৮ হাজার কর্মী সংখ্যা কমিয়েছে। অর্থাভাবের অজুহাতে কর্মীদের শোষণ করছে সরকার এবং বেস্ট কর্তৃপক্ষ। অথচ বেসরকারি কনকিয়া কোম্পানির কাছ থেকে বেস্টের পাওনা ৩২০ কোটি টাকা আদায়ে তাদের কোনও উদ্যোগ নেই। এস ইউ সি আই (সি) দাবি করেছে বাস পরিষেবাকে মুনাফার দৃষ্টিতে না দেখে জনস্বার্থে দেখতে হবে এবং মুম্বই বাস শ্রমিকদের সমস্ত ন্যায্য দাবি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নতুন রেল লাইনের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র ডি আর এম ডেপুটেশন

২ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির তরফ থেকে শিয়ালদহ ডি আর এম দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করা হয়। শিয়ালদহ সাউথ সেকশনের নামখানা, ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং শাখায় ট্রেন বাড়ানো, প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং জয়নগর মজিলপুর থেকে রায়দীঘি, মৈপীঠ, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং থেকে ঝড়খালি ও গদখালি, তালদি থেকে ভোজেরহাট হয়ে শিয়ালদহ পর্যন্ত নতুন ট্রেন চালু করা প্রভৃতি দাবিতে ছিল এই কর্মসূচি। নিউ গড়িয়াকে টার্মিনাল স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করে নামখানা, ডায়মন্ডহারবার ও ক্যানিং শাখায় নতুন ট্রেন চালানো প্রভৃতি দাবিও জানানো হয়।

ডি আর এম বলেন, নিউ গড়িয়ার ডিজাইন তাদের ভুল হয়েছিল। তা সংশোধন করে নতুন ট্রেন চালানো যাবে কি না আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে জানাবেন। ১৬টা স্টেশনের ৩২টা প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ ২০১৯-এর মধ্যে করে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

নতুন রেললাইন পাতার বিষয়টি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানাবেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন বিধায়ক ও দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণকান্তি নস্কর, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অজয় সাহা সহ কমরেডস অম্লান সরকার, নারায়ণ নস্কর, গৌতম মণ্ডল, প্রবীর চক্রবর্তী, বলরাম কয়াল প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com